স্বাস্থ্য সংলাপ

ISSN 1021-2078

ICDDR,B
CENTRE
FOR HEALTH AND POPULATION RESEARCH

আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ

বর্ষ ৪ সংখ্যা ৪

মাঘ ১৪০২

...পরক খাবার ... ৩
...জখম, প্রাথমিক পরিচর্যা ... ৫
চুলকানি প্রতিরোধ ... ৭
বিশ্ব এইডস দিবস ... ৮

প্রজনন তন্ত্রের সংক্রমণ

ডা: মহসীন আহমেদ ও ডা: তানজিনা মির্জা

গ্রামে কিংবা শহরে যেখানেই মহিলা স্বাস্থ্যকর্মীগণ কাজ করছেন তাঁরা সকলেই "প্রজনন তন্ত্রের সংক্রমণ" সম্পর্কে পরিচিত। ইংরেজীতে একে বলা হয় Reproductive tract infection অর্থাৎ প্রজনন বা সন্তান জন্মের সঙ্গে যে তন্ত্র সরাসরিভাবে জড়িত তার সংক্রমণকেই প্রজনন তন্ত্রের সংক্রমণ বলা হয়। স্ত্রী প্রজনন তন্ত্র যোনিপথ, জরায়ুর

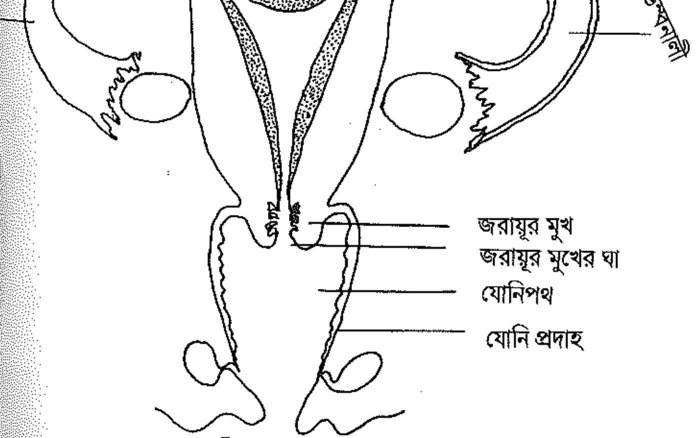

স্ত্রী প্রজনন তন্ত্র

মুখ (সারভিকস), জরায়ু, ডিম্বনালী (টিউব) ও ডিম্বাশয় বা ওভারী দিয়ে গঠিত (চিত্র)।

নানা কারণে এ-তন্ত্র সংক্রমিত হতে পারে। এ-সংক্রমণের প্রধান উপসর্গ হচ্ছে যোনিপথ দিয়ে একধরনের তরল পদার্থ নির্গত হওয়া যা খুবই অস্বস্তিকর। এছাড়া চুলকানি, ঘা এবং প্রস্রাবে যন্ত্রণাও দেখা দিতে পারে।

বাংলাদেশসহ বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশসমূহে অগণিত মহিলা এ-রোগে ভোগে থাকেন। বাংলাদেশে এর কতগুলো স্থানীয় নাম আছে, যেমন

(৪ এর পাতায় দেখুন)

জল বসন্ত

ডাঃ এম. আমিনুল ইসলাম ও

ডাঃ নাসিমা জে. আমিন

বসন্ত হয়েছে এ-কথা শুনলে এখনো যে কেউ আঁতকে উঠবেন। যে বাড়িতে বসন্ত হয় সে-বাড়িতে সহজে কেউ যেতে চান না। এখনো বসন্ত বললে আমাদের স্মৃতিতে ভেসে উঠে গুটি বসন্তের ভয়াবহতা। গুটি বসন্ত হলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রোগীর মৃত্যু হতো, আর যারা বেঁচে থাকতো তাদের হয় সমস্ত শরীরে দাগ হয়ে বিকৃত হয়ে যেতো অথবা তারা অন্ধ বা বধির হয়ে যেতো। কিন্তু এখন যে বসন্ত দেখা যায়, তা হলো জল বসন্ত। ভয়াবহতার দিক থেকে এটা তেমন জটিল রোগ নয়। প্রকৃতপক্ষে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত কোনটা গুটি বসন্ত আর কোনটা জল বসন্ত তা পৃথক করা যেত না। ১৯৭৯ সালে সমগ্র বিশ্ব থেকে গুটি বসন্ত নির্মূল হয়েছে। এরপর যত বসন্ত হয়েছে সবই জল বসন্ত। জল বসন্ত হয় ভ্যারিসেলা-জোস্টার নামের এক প্রকারের ভাইরাস থেকে। এই ভাইরাস মানবদেহে জল বসন্ত ও হারপিস জোস্টার নামের দু'ধরনের রোগ সৃষ্টি করে থাকে। সাধারণত শিশুকালে এই ভাইরাসের সংক্রমণে হয় জল বসন্ত। আর বয়স্কদের ক্ষেত্রে জল বসন্ত হতে পারে অথবা সুপ্ত এই ভাইরাসের পুনসংক্রমণ ঘটলে হয় হারপিস জোস্টার নামক রোগ। হারপিস জোস্টার-এর গুটিগুলোও জল বসন্তের ন্যায় পানি নিয়ে ওঠে। তবে এগুলো জল বসন্তের মত সারা শরীরে না উঠে শরীরের অংশবিশেষে সীমিত থাকে। আর এতে প্রচণ্ড ব্যথা হয় এবং গভীর ক্ষতের সৃষ্টি হয়।

বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে জল বসন্তের প্রকোপ দেখা দেয়। শিশুরাই প্রধানতঃ জল বসন্তে আক্রান্ত হয়ে থাকে। শতকরা ৬০ ভাগ ক্ষেত্রে এই আক্রমণ ঘটে ৫ থেকে ৯ বৎসর বয়সের মধ্যে। রোগ সংক্রমণের প্রায় ২ সপ্তাহ পর রোগের লক্ষণাদি প্রকাশ পায়। প্রথম ২ দিন অল্প-অল্প জ্বরের সঙ্গে গা, হাত ও পা ব্যথা করতে থাকে। তিন দিনের মাথায় শরীরে গোলাপী রঙের ছোট-ছোট গুটি দেখা দেয়। কয়েক ঘন্টার মধ্যেই এগুলো শিশিরবিন্দুর মত পরিষ্কার পানিযুক্ত

গুটিতে পরিণত হয়। এই স্বচ্ছ গুটিগুলো ধীরে-ধীরে পূঁজযুক্ত ঘন গুটিতে রূপান্তরিত হয়। ক্রমান্বয়ে এই গুটিগুলো শুকিয়ে শক্ত খোসাযুক্ত হয়। তিন থেকে চার দিনের মধ্যে ঝাঁকে ঝাঁকে নতুন-নতুন গুটি দেখা দেয় এবং একইভাবে শক্ত খোসাযুক্ত হতে থাকে। জল বসন্তের বিশেষ লক্ষণ হলো এতে একই সঙ্গে বিভিন্ন রকমের গুটি দেখা যায়—যেমন কতকগুলো লাল বা গোলাপী রঙের সদ্য-ওঠা গুটি, কতকগুলো শিশিরবিন্দুর মত এবং কতকগুলো পূঁজ ও শক্ত খোসাযুক্ত। এগুলো সাধারণত মুখ থেকে শুরু হয়ে পিঠে ও পেটে বেশি ছড়িয়ে পড়ে। হাতে ও পায়ে শেষের দিকে ওঠে এবং পরিমাণে তেমন একটা বেশি দেখা যায় না। মুখগহ্বরে এবং খাদ্যনালীতেও এগুলো উঠে থাকে, আর সেজন্য গলা ব্যথা হয় এবং খেতে কষ্ট হয়।

জল বসন্ত কিভাবে ছড়ায়?

আগে ধারণা করা হতো রোগীর হাঁচি ও কাশির মাধ্যমে জীবাণু বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে। এই জীবাণু সুস্থ ব্যক্তির শ্বাসের মাধ্যমে শরীরের ভিতর প্রবেশ করে রোগের সংক্রমণ ঘটায়। সাম্প্রতিককালে দেখা গিয়েছে এধরনের বায়ুবাহিত সংক্রমণের চাইতে সরাসরি রোগী বা রোগীর ব্যবহৃত দ্রব্যাদির সাহায্যেই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রোগের বিস্তার ঘটে। গুটি ওঠার ২ দিন আগে থেকে শুরু করে গুটি শুকিয়ে যাওয়ার ৪/৫ দিন পর পর্যন্ত আক্রান্ত রোগীর সংস্পর্শে এলে রোগের সংক্রমণ ঘটতে পারে। একজন অসুস্থ রোগীর কাছ থেকে রোগ সংক্রমণের প্রায় ২ সপ্তাহ পর সংক্রামিত ব্যক্তির মধ্যে রোগের লক্ষণাদি প্রকাশ পায়। কিছুদিন আগে পর্যন্তও ধারণা ছিল যে জল বসন্ত একবার হলে সারা জীবনে আর হয় না। সাম্প্রতিককালে রক্ত পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে, বাইরে প্রকাশ না পেলেও রক্তে এ-রোগ সংক্রমণের লক্ষণ সুস্পষ্ট। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দ্বিতীয় দফায় রোগ দেখা দিতে পারে। তবে এমনটি ঘটে খুব স্বল্প ক্ষেত্রে।

গর্ভাবস্থায় মা জল বসন্তে আক্রান্ত হলে গর্ভজাত বাচ্চার কোনো ক্ষতি হতে পারে কি?

১৯৪৭ সালে প্রথম একজন আক্রান্ত মায়ের বাচ্চা প্রসবের পর দেখা যায় জন্মগতভাবে তার একটি হাত নেই এবং সারা শরীরের চামড়া কুঁচকানো ও কাটা-দাগের মত ক্ষতযুক্ত। এরপর খুবই স্বল্পসংখ্যক ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে, মায়ের গর্ভকালীন জল বসন্তের ফলে গর্ভপাত ঘটে বা বাচ্চার চোখ নষ্ট হয়ে যায়, হাতে আঙ্গুল হয় না অথবা বোবা শিশুর জন্ম হয়। এধরনের জটিলতা সাধারণতঃ গর্ভাবস্থার প্রথম দিকে জল বসন্তে আক্রান্ত হলে হতে পারে। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বাচ্চা ও মা উভয়ই সুস্থ থাকে।

জল বসন্তের প্রতিকার

জল বসন্তের কোনো ফলপ্রসূ টিকা এখনো আবিষ্কৃত হয় নি। ফলে এর প্রতিরোধ এখনো সম্ভব নয়। সেজন্য আক্রান্ত অবস্থায় রোগীর যত্নই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। অনেক সময় আক্রান্ত রোগীকে বিভিন্ন প্রকার ওষুধ খাওয়ানো হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই ওষুধ অপ্রয়োজনীয় এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে ক্ষতিকারক। পরিষ্কার তুলা দিয়ে গুটিগুলোতে

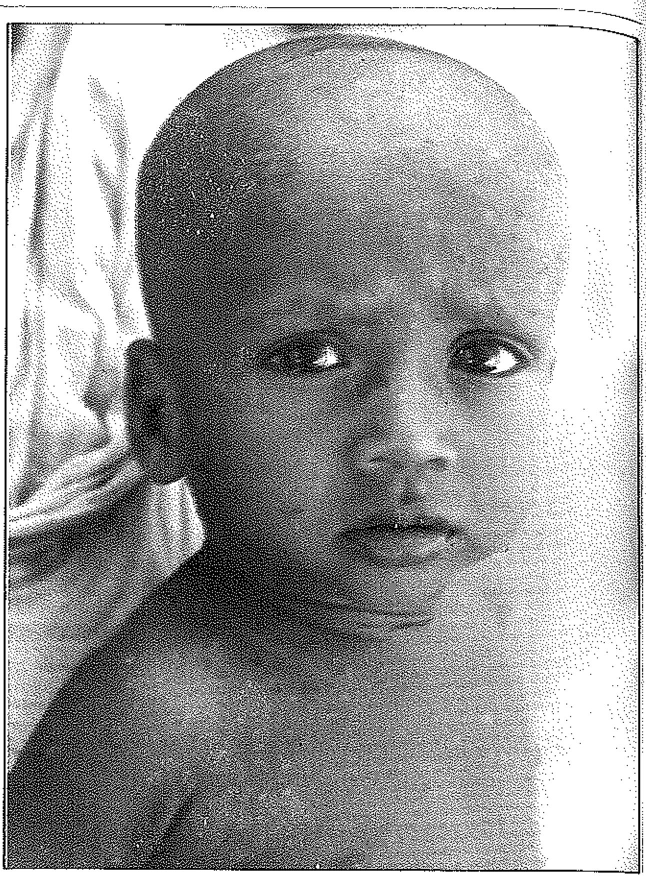

ক্যালামিন লোশন লাগালে যন্ত্রণার অনেকখানি উপশম ঘটে। রোগের স্বাভাবিক নিয়মে দুই বা তিন সপ্তাহের মধ্যে রোগ ভাল হয়ে যায়। ওষুধ প্রয়োগ করে তাড়াতাড়ি রোগ থেকে মুক্তি সম্ভব নয়। জ্বর বেশি হলে বা গায়ে বেশি ব্যথা হলে রোগীকে প্যারাসিটামলজাতীয় ওষুধ দেওয়া যায়। এ্যান্টিহিস্টামিনজাতীয় ওষুধ সেবনে চুলকানি কম হয়। অনেক সময় জ্বরের প্রকোপ বেশি হলে এবং সাথে কাশি বা শ্বাসকষ্ট থাকলে এ্যান্টিবায়োটিকজাতীয় ওষুধ দেওয়া হয়—তবে চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া এধরনের ওষুধ খাওয়ানো উচিত নয়। রোগ সেরে যাবার পর অনেকেই শরীরের বিশেষত মুখের দাগ নিয়ে বিব্রত থাকেন। এসব দাগ সময়ের ব্যবধানে এমনিতেই চলে যায়। অনেক সময় মুখে স্টেরয়েডজাতীয় ক্রিম লাগালে দাগ তাড়াতাড়ি চলে যায়। মনে রাখতে হবে এই ক্রিম বেশি দিন ব্যবহার করা ক্ষতিকর।

আমাদের দেশে কুসংস্কার আছে যে জল বসন্ত হলে ঘরে মাছ, মাংস বা ডিম আনা যায় না। কিন্তু বাস্তব সত্য হল, এধরনের রোগীকে আগের চেয়ে বেশি করে মাছ, মাংস, ডিম ও অন্যান্য পুষ্টিকর খাবার খাওয়ানো উচিত। হাতের নখ বা অপরিষ্কার কোনো জিনিস দিয়ে গুটি চুলকানো উচিত নয়। রোগীকে আলাদা করে রেখে তার ব্যবহার্য দ্রব্যাদি আলাদা করে পরিষ্কার করা ভাল। তবে মনে রাখতে হবে, গুটি দেখা দেওয়ার আগে থেকেই রোগ ছড়ানো শুরু হয় এবং রোগীকে আলাদা রাখলেও রোগের বিস্তার ঘটতে পারে। জল বসন্তের প্রকোপ এত বেশি যে জীবদ্দশায় কোনো না কোনো সময়ে এ-রোগে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা থাকে। তবে বড়দের ক্ষেত্রে রোগের জটিলতা বেশি।

শিশুর বাড়তি বা পরিপূরক খাবার

মুহম্মদ মুজিবর রহমান

বাড়তি বা পরিপূরক খাদ্য : বাড়তি বা পরিপূরক খাবার বলতে বুঝায় দুধ ছাড়া অন্যান্য খাবারের সাথে শিশুকে পরিচিত করানো এবং আগ্রহী করে তোলা।

চার মাস বয়স পর্যন্ত মায়ের দুধ থেকেই শিশু পর্যাপ্ত শক্তি ও পুষ্টি পেয়ে থাকে। এসময় একমাত্র মায়ের দুধ ছাড়া অন্য কোনো খাবার খাওয়ানোর প্রয়োজন নেই। এমনকি পানি পর্যন্ত নয়। তাছাড়া চার মাসের পূর্বে শিশু অন্যান্য খাবার হজমও করতে পারে না। চার মাসের পর থেকে মায়ের দুধ ছাড়াও শিশুকে বাড়তি খাবারের সাথে পরিচয় করানো এবং ধীরে–ধীরে তার পরিমাণ বাড়ানো দরকার যাতে সে পর্যাপ্ত শক্তি ও পুষ্টি পেতে পারে। কারণ জন্মের সময় অথবা এক মাস বয়সের সময় শিশুর জন্ম–ওজন থেকে ছয় মাসের ওজন প্রায় দ্বিগুণ হয়ে যায়। ছয় মাস থেকে এই ওজন বেড়েই চলে। শরীর ও ওজন বৃদ্ধির সাথে শিশুর খাবারের চাহিদা ও কার্যক্ষমতা বেড়ে চলে। ছয় মাস থেকে নয় মাস বয়স পর্যন্ত সময়টা শিশুদের জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এসময় শিশুর বৃদ্ধি ও খাবারের চাহিদা যেন হঠাৎ করেই বেড়ে যায় (টেবিল–১)। পাঁচ–ছয় মাস বয়স থেকে অতিরিক্ত শক্তি ও পুষ্টির প্রয়োজন হয়—যা মায়ের দুধ মেটাতে পারে না। বিশেষ করে কার্বোহাইড্রেট (শর্করা) ও প্রোটিন (আমিষ)–এর চাহিদা বেড়ে যায়। তাই এসময় থেকেই মায়ের দুধের পাশাপাশি অন্যান্য বাড়তি খাবার খাওয়ানো শুরু করা উচিত।

টেবিল ১–এ দেখা যায় যেখানে এক মাস বয়সের শিশুর ওজন ছিল ৪.১ কেজি তা ছয় মাসে বেড়ে ৮.০ কেজি হয়েছে অর্থাৎ প্রায় দ্বিগুণ। সেই সাথে এক–মাসের শিশুর ক্যালরীর প্রয়োজন ছিল ১৯৯০ কিলো জুলস (৪৭৬ কিলো ক্যালরী), ছয় মাসের শিশুর প্রয়োজন বেড়ে হচ্ছে ৬২০০ কিলো জুলস (১৪৮২ কিলো ক্যালরী) অর্থাৎ দ্বিগুণের চেয়ে অনেক বেশি—যা মায়ের দুধ থেকে পূরণ হতে পারে না। এর ফলে শিশুর স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হওয়া ছাড়াও পুষ্টিহীনতাজনিত সমস্যার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। শিশু রুগ্ন ও শীর্ণকায় হয়ে যায়। অন্যথায় এই বয়সের পর থেকে নয় মাস বয়স পর্যন্ত অন্যান্য খাবার খেতে অনীহা দেখা দিতে পারে। তবে বাড়তি খাবারের সাথে পরিচয় করানোর আগে ফলের রস অথবা অন্যান্য পানীয় (কোক, ফান্টা, পেপসি ইত্যাদি) খেতে দেওয়া উচিত নয়। কারণ, এতে আবার মায়ের দুধের প্রতি তার আগ্রহ কমে যেতে পারে অথবা বাড়তি খাবার খাওয়াতে অসুবিধা দেখা দিতে পারে। মনে রাখতে হবে, বাড়তি খাবার মায়ের দুধের বিকল্প নয়, বরং শক্তি ও পুষ্টির ঘাটতি পূরণের অন্যতম ব্যবস্থা।

লক্ষণীয় যে শিশু নয় মাস বয়স থেকে চুষতে শুরু করে যদিও কার্যকরভাবে তা পারে না, তাই বাড়তি খাবার নরম ও গিলে খাওয়ার উপযোগী করে দিতে হবে। এতে শিশুর চুষে–খাওয়ার প্রতি আগ্রহ বাড়বে। এই বাড়তি খাবার খাওয়ানোর সময় হচ্ছে ছয় মাস বয়স থেকে দু'বৎসর পর্যন্ত। হিন্দু–ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে পাঁচ থেকে আট মাসের বয়সের শিশুর মুখে ভাত দেওয়ার আনুষ্ঠানিক উৎসব অন্নপ্রাসন (মুখে ভাত দেওয়া) পালন করার প্রথা প্রচলিত রয়েছে, অর্থাৎ তরল খাবার থেকে অপেক্ষাকৃত শক্ত খাবারের সাথে শিশুকে পরিচিত করানো হয়। ছয় মাস বয়স থেকে নয় মাস বয়স পর্যন্ত অল্প নরম খাবার অথবা খাবার চটকে দিতে হবে যাতে শিশু সহজেই খেতে পারে এবং খাবারের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করতে পারে। দু'বছর বয়সে শিশুর সব দাঁতগুলো ওঠে, ফলে সহজেই শক্ত খাবার খেতে পারে যা পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা খেয়ে থাকে।

যেসব মায়েদের বুকে পর্যাপ্ত দুধ থাকে না তাঁরা তাঁদের শিশুদের জন্য গরুর দুধের উপর নির্ভরশীল হন। কিন্তু যেহেতু গরুর দুধের ঘনত্ব ও প্রোটিনের উপস্থিতি মায়ের দুধের চেয়ে অনেক বেশি (টেবিল–২), সে–হেতু শিশুরা সহজে গরুর দুধ হজম করতে পারে না। তাই গরুর দুধে পানি মিশিয়ে পাতলা করে খাওয়ানো হয়। এতে প্রোটিনের ঘাটতি না হলেও অন্যান্য উপকরণগুলোর পরিমাণ খুবই কমে যায়। কাজেই পানি মেশালে দুধ এবং এর ফলে শিশুর প্রয়োজনীয় শক্তি ও **পুষ্টি** মেটাতে পারে না। কিন্তু ছয় মাস বয়সের পর শিশু সহজেই গরুর দুধ খেতে পারে। তবে তা ভালভাবে ফুটিয়ে নিতে হবে।

এই বাড়তি খাবার কি এবং কিভাবে খাওয়াতে হবে

চার মাস বয়সের পর থেকে শিশুকে আধা–সেদ্ধ ডিম, মাছ বা মুরগীর মাংস, কলা, পাকা পেপে চটকিয়ে একটু–একটু করে আঙ্গুলের সাহায্যে মুখে দিতে হবে। এর পর হালুয়া, সুজি একইভাবে খাওয়ানোর চেষ্টা করতে হবে। অথবা খৈ বা মুড়ি বা চিড়া গুঁড়ো করে তার সাথে ভাজা মুগ ডাল গুঁড়ো করে পানিতে গুলে খাওয়ানো যেতে পারে। পৃথিবীর বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশসমূহে নিজ দেশে উৎপাদিত শষ্যদানা (cereal), যেমন চাল, গম, ভূট্টা, বাজার থেকে প্রস্তুত করা খিচুড়িজাতীয় খাবার তৈরি করে শিশুদের খাওয়ানো হয়। চাল, ডাল, মাছ বা মাংস বা ডিম এমনকি শুটকী মাছের গুঁড়ো, সবুজ শাক–শব্জি, তেল বা ঘি মিশিয়ে রান্না করা খিচুড়ি শক্তি ও পুষ্টির দিক থেকে উৎকৃষ্ট খাবার। খাবার প্রস্তত করার সময় লবণ পরিহার করতে হবে। শিশুরা এই জাতীয় খাবার খুবই পছন্দ করে।

টেবিল–১ : শিশুর বয়স বৃদ্ধির সাথে প্রয়োজনীয় শক্তি (ক্যালরী)

বয়স	গড় ওজন		প্রয়োজনীয় শক্তি কিলো জুলস	
	বালক	বালিকা	বালক	বালিকা
১ মাস	৪.১৫	৪.০০	১৯৯০	১৯২০
৩ মাস	৬.১২	৫.৭০	২৫৭০	২৩৯০
৬ মাস	৮.০০	৭.৪৪	৬২০০	৫৯৮০
১২ মাস	১০.০০	৯.৫০	৪০২০	৩৮০০
২ বৎসর	১২.০০	১১.৮০	৪৯৬০	৪৭২০
৩ বৎসর	১৪.০০	১৩.৮৫	৫৭৬০	৫৫৪০

(৬–এর পাতায় দেখুন)

প্রজনন তন্ত্রের সংক্রমণ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সূতিকা, ধাতু-ভাংগা ইত্যাদি। ধারণা করা হয়, প্রজনন তন্ত্রের সংক্রমণে যে তরল পদার্থ নির্গত হয় তাতে শরীরের সার পদার্থ বেরিয়ে যায়, যার ফলশ্রুতিতে শারীরিক দুর্বলতা লক্ষ্য করা যায়, মাথা ঝিম-ঝিম করে ও কাজে অনিহা দেখা দেয়। অনেকে স্থানীয় কবিরাজের পরামর্শ নিয়ে থাকেন এবং পানি-পড়া ও তাবিজ নেওয়ার দ্বারা এর চিকিৎসা করে থাকেন। যেহেতু প্রজনন তন্ত্রের সংক্রমণ একটি গোপন তন্ত্রের অসুখ, সে-হেতু এবিষয় নিয়ে প্রকাশ্যে খুব একটা আলাপ-আলোচনা করাও সম্ভব হয় না। ফলে এ-রোগ সম্পর্কে আমরা অনেকে সচেতন নই।

প্রজনন তন্ত্রে সংক্রমণ মূলত নিচে উল্লেখিত তিনটি কারণে হয়ে থাকে ঃ

১. যেকোনো কারণে প্রজনন তন্ত্রের অভ্যন্তরীণ পরিবেশে বিঘ্ন ঘটা,
২. যৌন রোগ
৩. সেবাদানকারীদের দ্বারা।

অভ্যন্তরীণ পরিবেশে বিঘ্ন : আমাদের মুখ, নাক, চোখ ও পরিপাক তন্ত্রের ন্যায় প্রজনন তন্ত্রেও রয়েছে উপকারী কিছু জীবাণু, এদের আচরণ দ্বারা অভ্যন্তরীণ ভারসাম্য রক্ষা হয়। কোনো কারণে এই ভারসাম্য নষ্ট হলে এদের আচরণে পার্থক্য দেখা দেয় এবং এরা সংক্রমণ ঘটিয়ে থাকে। ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য পরিচর্যার সঙ্গে এধরনের সংক্রমণ খুব বেশি জড়িত। আমাদের দেশে অনেক মা-বোনেরাই মাসিকের সময় পরিস্কার কাপড় ব্যবহার করেন না এবং একই কাপড় পুকুরের পানিতে ধুয়ে ঘরের ভিতরে শুকিয়ে নিয়ে আবার সেটিই ব্যবহার করেন। পরিস্কার পানি, সাবান এবং রোদের আলো না পাওয়ার কারণে কাপড়ের টুকরাটি পরিচ্ছন্ন করা সম্ভব হয় না। এর ব্যবহারে প্রজনন তন্ত্রের অভ্যন্তরীণ ভারসাম্য নষ্ট হতে পারে। এধরনের সংক্রমণই সবচেয়ে বেশি লক্ষণীয়। বিভিন্ন ধরনের ওষুধ সেবনেও অভ্যন্তরীণ ভারসাম্য নষ্ট হয়ে থাকে।

যৌন রোগ : কিছু কিছু রোগ আছে যা যৌন সম্পর্কের মাধ্যমে ছড়িয়ে থাকে। সিফিলিস ও গনোরিয়া রোগ দু'টি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া আরো কিছু রোগ আছে যা যৌনক্রিয়ার মাধ্যমে যৌনসঙ্গীর মধ্যে সংক্রমিত হয়ে থাকে। এর মধ্যে ক্ল্যামেডিয়া, ট্রাইকোমনিয়াস, হারপিস, জেনিটাল ওয়ার্ট বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এসব রোগ যেমনি প্রজনন তন্ত্রে ঘা এবং ক্ষত সৃষ্টি করতে পারে আবার তেমনি প্রজনন তন্ত্র থেকে তরল পদার্থও নির্গত করতে পারে। গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে আমাদের সমাজে এসব যৌনরোগের প্রকোপ অনেক বেশি।

সেবাদানকারীদের দ্বারা : আমাদের দেশে শতকরা নব্বইটি প্রসবে সহায়তা করে থাকেন কোনোরকম প্রশিক্ষণ নেই এমন দাইগণ। স্বভাবতই এসব প্রসব স্বাস্থ্যসম্মত নয়। বাচ্চা প্রসব করানোর সময় পরিচ্ছন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ না করার কারণে মায়ের প্রজনন তন্ত্র সংক্রমিত হয়। গর্ভপাতেও এমন ঝুঁকি থাকে। তাছাড়া জন্মনিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি হিসেবে আইইউডি স্থাপনের সময় যথাযথ জীবাণুমুক্তকরণ ব্যবস্থা গ্রহণ না করার কারণেও প্রজনন তন্ত্র সংক্রমিত হতে পারে।

উপসর্গ : সংক্রমণ ভেদে রোগের উপসর্গের তারতম্য ঘটে থাকে। পূর্বেই বলা হয়েছে যে এ-রোগের প্রধান উপসর্গ হচ্ছে স্রাব। এ-স্রাবের রং ও পরিমাণ বিভিন্ন রকম হতে পারে। প্রস্রাবের রাস্তাও সংক্রমিত এবং সেখানে ব্যথাও অনুভূত হতে পারে। আবার কখনোবা যৌনাঙ্গে ঘা দেখা দিতে পারে। সিফিলিসের ঘা ব্যথাহীন হয়ে থাকে এবং কিছুদিন পর এমনিতেই এ-ঘা শুকিয়ে যায়। তবে এর জীবাণু রক্তের সাথে মিশে পরবর্তীকালে নানাধরনের উপসর্গের সৃষ্টি করতে পারে। অন্যান্য ঘা হয় ব্যথাযুক্ত।

জটিলতা : প্রজনন তন্ত্রের সংক্রমণের জটিলতাগুলো অত্যন্ত মারাত্মক। সংক্রমণের প্রকারভেদে যেমন উপসর্গের পার্থক্য লক্ষ করা যায়, তেমনি জটিলতাও ভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। নিম্নে জটিলতার একটি সাধারণ চিত্র তুলে ধরা হলো ঃ

সংক্রমণ যোনিপথ ধরে উপর দিকে জরায়ুতে প্রবাহিত হতে পারে। জরায়ু হয়ে দু'দিকের দুই ডিম্বনালীতে সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ে। এ-অবস্থাকে ইংরেজীতে বলে Pelvic inflammatory disease (PID)। এ-রোগের যথাযথ চিকিৎসা করা না হলে ডিম্বনালী আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে যেতে পারে। আংশিকভাবে বন্ধ হলে পরবর্তীকালে ডিম্বনালীতে ভ্রূণের অস্বাভাবিক অবস্থানের (ectopic/tubal pregnancy) কারণে মায়ের মৃত্যুও হতে পারে। যদি সম্পূর্ণভাবে ডিম্বনালী বন্ধ হয়ে যায় তা হলে ডিম্বাশয় (ovary) থেকে ডিম্বাণুর জরায়ুতে প্রবেশের পথ বন্ধ হয়ে যায়। পরিণতিতে সে-মহিলা হয়ে যান বন্ধ্যা। সন্তান ধারণের আর কোনো সম্ভাবনা তাঁর থাকে না। এছাড়া গবেষণায় আরো দেখা গিয়েছে, যেসব মায়েরা প্রজনন তন্ত্রের সংক্রমণ থাকা-অবস্থায় গর্ভবতী হয়ে থাকেন তাঁদের ক্ষেত্রে গর্ভপাতের সম্ভাবনা বেশি। গর্ভপাত না হলেও গর্ভস্থ শিশুর ওজন সঠিকভাবে বৃদ্ধি পায় না এবং পরিণতিতে কম-ওজনের শিশু ভূমিষ্ঠ হয়। কম-ওজনের শিশুর মৃত্যু-ঝুঁকি বেশি। আবার কোনো কোনো সংক্রমণ গর্ভস্থ শিশুকেও সংক্রমিত করতে পারে, যেমন সিফিলিস। মায়ের গনোরিয়া বা ক্লামেডিয়া রোগ থাকলে জন্মের সময় শিশুর চোখ সংক্রমিত হতে পারে। প্রজনন তন্ত্রের সংক্রমণে জরায়ুর মুখের ক্যান্সারের ঝুঁকি বেড়ে যায়। এশিয়া মহাদেশে সারভিকসের ক্যান্সার সবচেয়ে বেশি। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের কথা জটিলতায় উল্লেখ না করলেই নয়। তা হলো এইডস। প্রজনন তন্ত্রের সংক্রমণে যেহেতু তন্ত্রের বিভিন্ন স্থানে ক্ষত বা ঘা দেখা দেয়, সেহেতু এর আত্মরক্ষামূলক প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। এইডস ভাইরাস অতি সহজে উন্মুক্ত স্থান দিয়ে প্রবেশের পথ পেয়ে থাকে। যাঁরা প্রজনন তন্ত্রের সংক্রমণে ভুগছেন তাঁদের মধ্যে এইডস ভাইরাস সঞ্চারিত হওয়ার সম্ভাবনা সুস্থ প্রজনন তন্ত্রের তুলনায় ৫ থেকে ১০ গুণ বেশি।

রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা ঃ প্রজনন তন্ত্রের সংক্রমণ সুনির্দিষ্টভাবে কোনো জীবাণু দ্বারা ঘটেছে কিনা তা নির্ণয় করার জন্য ল্যাবরেটরীর সাহায্য নেওয়া প্রয়োজন। এ-রোগের ব্যাপকতা এবং উন্নয়নশীল দেশের গ্রাম-পর্যায়ে ল্যাবরেটরী পরীক্ষার অসুবিধার কথা ভেবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সিনড্রোমিক ম্যানেজমেন্ট নামে একটি ব্যবস্থাপনার প্রচলন করেছে। এ ব্যবস্থাপনায় রোগীর অসুবিধার কথা শুনে এবং বিশেষ করে যৌনাঙ্গ পরীক্ষা করে চিকিৎসা করা যায়। এতে সুনির্দিষ্ট রোগ নির্ণয়ের প্রয়োজন হয় না। আমাদের দেশের পরিবার কল্যাণ

সহায়িকা সমমানের প্যারামেডিকস্‌ দ্বারা এর চিকিৎসা করা সম্ভব। এ-ব্যবস্থাপনায় ব্যবহৃত ওষুধগুলোর মধ্যে মেট্রনিডাজল, ডকসিসাইক্লিন, কোট্রাইমোক্সাজল, পেনিসিলিন, টেট্রাসাইক্লিন ও সিপ্রোফ্লুকসাসিন অন্যতম। এদের মধ্যে দু'একটি ওষুধ ব্যতীত অন্যগুলো তেমন ব্যয় সাপেক্ষ নয়। একটি কথা আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে যৌনসঙ্গীর চিকিৎসাও একান্ত প্রয়োজন।

প্রতিরোধ ঃ আমাদের সমাজে প্রজনন তন্ত্রের সংক্রমণ বহু পুরাতন একটি রোগ। সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে শতকরা বিশ জন মহিলা এ-রোগে ভুগছেন। আবার উপসর্গবিহীন অবস্থায়ও আছেন প্রায় সম-সংখ্যক মহিলা। এ-রোগের ব্যাপকতা অনুযায়ী এর চিকিৎসা তেমন গুরুত্ব পাচ্ছে না। এর কারণ হিসেবে বলা যেতে পারে : যেহেতু এটি মহিলাদের প্রজনন তন্ত্রের রোগ তাই লজ্জা, দ্বিধা ইত্যাদির কারণে এর প্রকাশ প্রাধান্য পায় নি। দ্বিতীয়ত, উল্লেখ করা যেতে পারে এর উপসর্গ বা জটিলতার কথা। এ-রোগে আক্রান্তকারীরা ডায়রিয়া, নিউমোনিয়া বা ধনুষ্টংকারের রোগীর মত হঠাৎ করে মারা যায় না, বরং দীর্ঘদিন যাবত কষ্টে ভুগে। আমাদের দেশের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচী মূলত লক্ষ্যমাত্রাভিত্তিক। মৃত্যু রোধ করা বা পরিবার পরিকল্পনার পদ্ধতি-গ্রহিতার হার বাড়ানোই এ-কর্মসূচীর মূল লক্ষ্য। যুগ যুগ ধরে মুখ বুজে-থাকা নারীর এ-সমস্যার কথা অতি সম্প্রতি প্রাধান্য পেয়েছে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে। প্রজনন স্বাস্থ্যের পরিচর্যা প্রতিটি দেশের কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করার আহ্বান জানানো হয়েছে আন্তর্জাতিক সম্মেলনে।

আমরা যাঁরা স্বাস্থ্য সেবা বা অন্যান্য উন্নয়ন কাজের সঙ্গে জড়িত আছি তাঁদের সবাইকে প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে অধিকতর জ্ঞান আহরণ করতে হবে। প্রজনন তন্ত্রের সংক্রমণ প্রতিরোধ সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে অবহিত করা প্রাথমিকভাবে আমাদেরই কাজ। সেই সঙ্গে সরকারী ও বেসরকারী স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্রে প্রজনন তন্ত্রের সংক্রমণের চিকিৎসা অন্তর্ভূক্ত করার এখনই সময়।

জেনে রাখা ভাল

চামড়ার জখম সারাবেন কিভাবে

চামড়া আমাদের শরীরের বাহিরের আবরণ। ছোট খাট আঘাত থেকে শুরু করে বাইরের বিভিন্ন ক্ষতিকারক প্রভাব থেকে শরীরকে রক্ষার প্রাথমিক কাজটি করে থাকে এই চামড়া। আমাদের দৈনন্দিন কাজকর্মের মধ্যে প্রতিনিয়ত চামড়া নানাভাবে ছোট-বড় আঘাত পেয়ে থাকে। আঘাতের তীব্রতা বেশি হলে চামড়া কেটে-ফেটে যায় ও রক্ত বের হয়। এমনকি চামড়ার নিচে রক্ত জমাট পর্যন্ত বেঁধে যেতে পারে। সাধারণত চামড়ার আঘাতজনিত ক্ষত সামান্য হলে এমনিতে রক্ত বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ যে-বিষয়টি তা হচ্ছে চামড়ার আঘাতজনিত ক্ষতে নানা রোগ-জীবাণু প্রবেশ করে সংক্রমণ সৃষ্টি করতে পারে। এ-কারণে জখম বা ক্ষত বড় হলে জখমের যথাযথ চিকিৎসার প্রয়োজন হয়। যথাযথ প্রাথমিক চিকিৎসায় ক্ষতস্থান দ্রুত সেরে ওঠে এবং সংক্রমণের আশংকাও কম থাকে।

আঁচড় লাগলে করণীয়

চামড়ায় নানারকম আঘাত লাগতে পারে, যেমন আঁচড় লাগা। বাড়িতে, অফিসে ও কর্মক্ষেত্রে এমনকি অন্যের দ্বারাও চামড়ায় বিশেষ করে হাতে-পায়ে আঁচড় লাগতে পারে। সাধারণতঃ আঁচড় লাগলে কোনো চিকিৎসার প্রয়োজন পড়ে না। এমনিতে সেরে যায়। তবে অনেক সময় ধুলিকণা মিশে আঁচড় লাগা স্থানে জীবাণু সংক্রমিত হতে পারে। তাই যেকোনো স্থানে আঁচড় লাগুক না কেন সাথে-সাথে পরিস্কার পানি, এ্যান্টিসেপটিক লোশন দিয়ে তুলার সাহায্যে মুছে দিতে হবে। এ্যান্টিসেপটিকের অভাবে ভাল সাবান ব্যবহার করা যেতে পারে। বাজারে স্যাভলনসহ নানাবিধ এ্যান্টিসেপটিক লোশন পাওয়া যায়। তবে ব্যান্ডেজ করার প্রয়োজন পড়ে না। এমনকি পরিস্কার পানি দিয়েও ধোয়া যেতে পারে।

চামড়ার গভীর ক্ষতে করণীয়

প্রথমতঃ চামড়ার গভীর ক্ষতে যে কাজটি করা দরকার তা হচ্ছে রক্তপাত বন্ধ করা। সাধারণতঃ জখমের স্থানে জখমের সাথে-সাথেই কিছু রক্ত নিঃসরিত হয়। সম্ভব হলে পরিস্কার কাপড়, গজ, ব্যান্ডেজ বা তুলা দিয়ে ক্ষত স্থানটি কয়েক মিনিট চেপে ধরতে হবে। ৫/৭ মিনিটের মধ্যে এমনিতেই রক্তপাত বন্ধ হয়ে যাবার কথা। অতপর চেপে-রাখা কাপড়টি সরিয়ে এ্যান্টিসেপটিক লোশন দিয়ে ভাল করে ক্ষতস্থানটি পরিস্কার করে পুনরায় পরিস্কার কাপড় বা ব্যান্ডেজ লাগিয়ে রাখতে হবে। তবে রক্ত যদি ফিনকি-দিয়ে অথবা বেশি মাত্রায় নির্গত হয় তবে ক্ষতস্থানে কাপড় বা তুলা অনেকক্ষণ চেপে রাখতে হবে (কমপক্ষে ৮/১০ মিনিট)। পাশাপাশি রোগীকে নিকটস্থ চিকিৎসা কেন্দ্রে বা হাসপাতালে স্থানান্তর করা দরকার।

ক্ষতস্থান যিনি পরিস্কার করবেন তার হাত ভাল করে সাবান দিয়ে ধুয়ে নেওয়া উচিত। ক্ষতস্থানের জমাট-বাঁধা রক্ত অথবা কোনো শক্ত বস্তু উঠিয়ে ফেলার সাথে-সাথে কিছুটা রক্তপাত হতে পারে। এমতাবস্থায় ক্ষতস্থান বড় হলে আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে নিকটস্থ হাসপাতালে নিতে হবে। বাড়িতে ভালভাবে ক্ষতস্থানের পরিচর্যা করতে পারলে অনেক সময় হাসপাতালে নেওয়ার প্রয়োজন নাও হতে পারে। ক্ষতস্থানটি পরিস্কার করে ভাল করে ব্যান্ডেজ করে দিতে হবে। প্রতিদিন একবার পুরাতন ব্যান্ডেজ খুলে নতুন পরিস্কার ব্যান্ডেজ করা উচিত। প্রতিবার ব্যান্ডেজের পূর্বে ক্ষতস্থানটি আগের নিয়মে যথারীতি পরিস্কার করে নিতে হবে।

আর একটি কথা মনে রাখতে হবে, আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তির যদি ধনুষ্টংকার প্রতিরোধক টিকা দেওয়া না থাকে তবে জখমের পরে অবশ্যই এই টিকা দিতে হবে।

আর যদি ক্ষতস্থান ড্রেসিং করার সময় ভিজা ভিজা দেখা যায় অর্থাৎ ইনফেকশন-এর মত মনে হয় তবে দেরি না করে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ওষুধ সেবন করতে হবে। ছোট ছোট রক্তনালীর রক্তপাত বন্ধ করার জন্য বরফ চেপে রাখলে উপকার পাওয়া যায়।

(৩ এর পাতার পর)

টেবিল-২ : মায়ের দুধের সাথে অন্যান্য দুধের তুলনামূলক চিত্র

রাসায়নিক উপাদান		মায়ের দুধ	গরুর দুধ	বাণিজ্যিক দুধ
এনার্জি (শক্তি)	(MJ/L)	৩.১	২.৯	২.৮
প্রোটিন (আমিষ)	(g/L)	৮.৯	৩১.৪	১৫.০
ল্যাকটো এলবুমিন	(g/L)	২—৩	১.১	৯.০
আই.জি.এ.	(g/L)	০.৫—১.০	—	—
ফ্যাট (চর্বি)	(g/L)	৪২.০	৩৮.০	৩৬.০
ল্যাকটোজ	(g/L)	৬০—৭০	৪৭.০	৭২.০
ভিটামিন-এ	(μg/L)	৬০০	৩৫০	৬০৫
ভিটামিন-ই	(μg/L)	৩৫০০	১৪০০	৭৪০০
ভিটামিন-সি	(mg/L)	৩৮	১৮	৩০
থায়ামিন	(μg/L)	১৬০	৪৩০	৪০০
রিবোফ্লাভিন	(μg/L)	৩০০	১৭০০	৫০০
নিয়াসিন	(μg/L)	২৩০০	২৫০	৪০০০
প্যান্টোথেনিক	(μg/L)	২৬০০০	৩৬০০	৪০০০
ফলিক এসিড	(μg/L)	৫২	৫৫	১০০
ভিটামিন বি১২	(μg/L)	০.১	৪.৫	১.৫
ক্যালসিয়াম	(mg/L)	৩৫০	১২০০	৫৭০
ফসফরাস	(mg/L)	১৫০	৯৪০	৩৫০
ম্যাগনেশিয়াম	(mg/L)	২৮	১২০	৬০
আয়রন (লৌহ)	(mg/L)	০.৮	০.৬	৮
জিঙ্ক	(mg/L)	৩	৩	৪
আয়োডিন	(μg/L)	৭০	৮০	৪০
সোডিয়াম	(mg/L)	১৫০	৪৫০	১৮০

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যায় যে শিশুদের জন্য ৪ থেকে ৯ মাস বয়স খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং শিশুদের স্বাভাবিক বিকাশের জন্য মায়ের দুধের পাশাপাশি অন্যান্য বাড়তি খাবার খাওয়াতে হবে। নয়তো শিশুর স্বাস্থ্য ও মেজাজ দু'টোই খারাপ হয়ে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা—যা ভবিষ্যতে মায়েদের চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। মনে রাখতে হবে, "শিশুর পিতা ঘুমিয়ে আছে সব শিশুরই অন্তরে!"

বাড়তি খাবার কেমন হবে

— পর্যাপ্ত শক্তি ও পুষ্টিসম্পন্ন
— পরিস্কার ও নিরাপদ
— সহজেই যোগাড় করা সম্ভব
— বেশির ভাগ শিশুর জন্য গ্রহণের উপযোগী
— নরম এবং সহজেই গিলতে পারে
— দামে কম
— সহজে তৈরি করা যায়।

বাড়তি খাবার প্রস্তুত করার কয়েকটি সহজ নমুনা দেওয়া হলো :

	উপকরণ	পরিমাণ (গ্রাম)	শক্তি কি: জুলস	শক্তি কি: ক্যালরী	প্রোটিন (গ্রাম)
১	চাল	১২০	১৭৯৭	৪৩০	১০
	ডাল (মুগ/মুশুর)	৫০	৭১১	১৭০	১০
	তেল বা ঘি	৫	১৮৮	৪৫	—
	পানি *				
			২৬৯৬	৬৪৫	২০.০
২	চাল	১২০	১৭৯৭	৪৩০	১০
	ডাল	২৫	৩৫৫	৮৫	৫
	মাছ বা মাংস অথবা	২৫	১২৬	৩০	৩.৩
	(ডিম ১টা)	(২৫)	(১৫৬)	(৩৭)	(৩.১)
	সবুজ শাক	—	—	—	—
	তেল বা ঘি	১০	৩৭৬	৯০	—
	পানি*				
			২৬৫৭	৬৩৫	১৮.৩
৩	সুজি/চালের গুঁড়ো/ পোরিজ	৭৫	১০৬৭	২৫৫	৬.০
	দুধ	৩০০	৮৩৭	২০০	১০
	তৈল বা ঘি	১০	৩৭৬	৯০	—
			২২৪০	৫৪৫	১৬.০

* পরিমাণ অনুযায়ী পানি দিয়ে রান্না করতে হবে যাতে খাবার খুব নরম হয়। সেই সাথে সামান্য পিয়াজ ও ছোট-ছোট করে কয়েক টুকরো আদা দেওয়া যেতে পারে।

৪	খৈ/মুড়ি/চিড়ার গুঁড়ো	৬০	৯০০	২১৫	৫.০
	ভাজা মুগ ডালের	২৫	৩৫৫	৮৫	৫.০
	গুঁড়ো দুধ*	২০০	৫৫৬	১৩৩	৬.৭
			১৮১১	৪৩৩	১৬.৭

* দুধ না থাকলেও কোনো অসুবিধে নেই। পরিমাণ মত পানিতে গুলে নিলেই চলবে। তবে যাতে বেশি শক্ত বা বেশি নরম ঢেল-ঢেলে (ঢেল-ঢেলা) না হয়।

চুলকানি

সংলাপ রিপোর্ট

চুলকানি (scabies) আমাদের একটি অতি পরিচিত স্বাস্থ্য সমস্যা। চুলকানিতে আক্রান্ত হন নি এমন ব্যক্তি বা পরিবার খুঁজে পাওয়া কঠিন। ঘনবসতিপূর্ণ, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বসবাসকারী লোকদেরই এই বিরক্তিকর রোগটি সবচেয়ে বেশি হয়। চুলকানি একধরনের ছোঁয়াচে রোগ, অর্থাৎ রোগীর সংস্পর্শে আসলে অথবা আক্রান্ত ব্যক্তির ব্যবহৃত কাপড়–চোপড় ও অন্যান্য দ্রব্যাদি ব্যবহার করলে সুস্থ লোক সহজে এ–রোগে আক্রান্ত হতে পারেন। একধরনের ক্ষুদ্র পরজীবী (Sarcoptes scabiei) দ্বারা চুলকানি রোগের সংক্রমণ ঘটে। এই পরজীবী শরীরের চামড়ার ওপর বাস করে এবং চামড়ার মৃত কোষ বা খুশকি খেয়ে বেঁচে থাকে। আর এই পরজীবীর জীবন–চক্র চামড়ার ওপর অথবা চামড়ার নিচে সক্রিয় থাকে। এই পরজীবী দ্বারা সংক্রমণ হলেই চুলকানি রোগের সৃষ্টি হয়।

রোগের উপসর্গ

সাধারণত পরজীবী হাতের আঙ্গুলের ফাঁকে–ফাঁকে ও হাতের উপরিভাগে বেশি দেখা যায়। শরীরের চামড়ার ভাঁজে ভাঁজে, কনুই, পা, গোড়ালি, নিম্নাঙ্গ এমনকি স্তনের বোটাতে পর্যন্ত চুলকানির সংক্রমণ ঘটে। চুলকানি দেখা দেওয়ার সপ্তাহ খানেকের মধ্যে সারা শরীর ভীষণ চুলকায়। চামড়ার উপরে ছোট ছোট দানার মত হয়, লোমের গোড়ায় দানা হওয়া এ–রোগের বৈশিষ্ট্য এবং এগুলো আস্তে–আস্তে লালচে রং হতে পারে। দানার ভিতরে পানি বা পুঁজ জাতীয় পদার্থ থাকে। অনেক সময় চুলকাতে চুলকাতে ঘায়ের মত ক্ষত সৃষ্টি হয়। এ–রোগ হলে রাতেই শরীর বেশি চুলকায়। অনেক সময় এলার্জি হতে চুলকানিকে আলাদা করা কঠিন হয়। মনে রাখতে হবে, এলার্জি একজন থেকে অন্যজনে ছড়াতে পারে না, অর্থাৎ ছোঁয়াচে নয়। কিন্তু চুলকানি অত্যন্ত ছোঁয়াচে হওয়ায় একজন থেকে অন্যজনের শরীরে সহজে সংক্রমিত হয়।

চিকিৎসা

- চুলকানি হলে যেদিন ওষুধ ব্যবহার করবেন ঐদিন গরম পানির সাহায্যে সাবান দিয়ে পরিস্কার করে গোসল করতে হবে।
- ভাল করে গোসলের পর মুখ ও মাথা ছাড়া সারা শরীরে চুলকানির পরজীবী–নিধনকারী তরল ওষুধ পরপর তিন দিন মাখতে হবে। এবং এই তিন দিন গোসল করা যাবে না। চতুর্থ দিন সকালে সাবান দিয়ে গোসল করে ফেলতে হবে। ওষুধের দোকানে এই চুলকানি–নাশক ওষুধ পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে চিকিৎসকগণ যেসব ওষুধ ব্যবহার করেন তা হচ্ছে ঃ

১. বড়দের ক্ষেত্রে ১০% আনগুয়েন্টাম সালফিউরিস এবং ছোটদের ক্ষেত্রে ৫.০% একই ওষুধ ব্যবহার করতে হবে।

২. অথবা বড়দের ক্ষেত্রে ২৫% বেনজাইল বেনজোয়েট এবং শিশুদের ক্ষেত্রে ১২.৫% একই ওষুধ মাখতে হবে।

৩. অথবা ৫% টেটমোসল অথবা ১০% গামা বেনজিন হেক্সা ক্লোরাইড লিকুইড প্যারাফিনে মিশিয়ে সারা শরীরে উপরে বর্ণিত নিয়মে মাখতে হবে।

- চুলকানি চিকিৎসায় ব্যবহৃত ওষুধ যথারীতি মাখার পরেও অনেক সময় শরীরে কিছুটা চুলকানি থেকে যায়। তাই ৭ দিন পর একই নিয়মে একই ওষুধ মুখ ও মাথা বাদ দিয়ে শরীরের বাকি অংশে পুনরায় মাখা উচিত।
- শরীর অত্যাধিক চুলকালে চুলকানি–নাশক লোশন মাখার পাশাপাশি এ্যান্টিহিসটামিনজাতীয় ওষুধ সেবন করলে চুলকানির মাত্রা কমে।
- অনেক সময় চুলকাতে চুলকাতে চামড়ায় প্রদাহ সৃষ্টি হতে পারে। অর্থাৎ ঘায়ে পুঁজ দেখা দিতে পারে। এক্ষেত্রে ক্লক্সাসিলিন খেয়ে বা এন্টিবায়োটিক মলম ব্যবহার করে আগে ঘা শুকিয়ে নিতে হবে। ঘা থাকা–অবস্থায় উপরোক্ত পরজীবী–নাশক তরল ওষুধ লাগানো ঠিক নয়।

নিমপাতার সাহায্যে চিকিৎসা

১. নিমপাতা বেটে সারা শরীরে পরপর তিনদিন মাখলে (এই তিন দিন গোসল করা যাবে না) চুলকানি উপশমে ভাল ফল পাওয়া যায়। নিমপাতা ব্যবহারের পর একই নিয়মে চতুর্থ দিন সকালে গোসল করে ফেলতে হবে এবং ৭ দিন পর একই নিয়মে পুনরায় নিমপাতা ব্যবহার করতে হবে।

২. নিমপাতা সিদ্ধ করে সেই পানি দিয়ে গোসল করলেও উপকার হয়।

৩. এছাড়া বাজারে নিমসাবান পাওয়া যায়। প্রতিদিন নিমসাবান দিয়ে গোসল করলেও ভাল ফল পাওয়া যায়।

চুলকানি প্রতিরোধ

- আক্রান্ত রোগীকে আলাদা রাখতে হবে।
- পূর্বেই বলা হয়েছে, চুলকানি একটি পরজীবী–সংক্রমিত ছোঁয়াচে রোগ। এ–রোগ পরিবারের একজনের হলে অন্যদেরও সংক্রমণের ঝুঁকি থাকে। তাই আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে–সাথে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদেরও একই নিয়মে চুলকানি নাশক তরল ওষুধ ব্যবহার করতে হবে।
- আক্রান্ত ব্যক্তির বিছানাপত্র, কাপড়–চোপড় সম্পূর্ণ গরম পানির সাহায্যে ফুটিয়ে ভাল করে সাবান দিয়ে ধুয়ে রোদে শুকাতে হবে।
- পরিবারের সবাইকে প্রতিদিন সাবান ও পরিস্কার পানি দিয়ে গোসল করতে হবে।
- পরিস্কার কাপড়–চোপড় ব্যবহার করতে হবে।
- বাড়ির এবং পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্য সচেতন করতে হবে। ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে হবে।
- ঘরের আশপাশ ও আঙ্গিনা পরিস্কার রাখতে হবে।
- নালা–নর্দমার অপরিস্কার পানিতে বাচ্চাদের নামতে দেওয়া যাবে না।
- হাতের নখ ছোট এবং পরিস্কার রাখতে হবে।
- চুলকানির প্রাথমিক লক্ষণ দেখা দিলেই ব্যবস্থা নিতে হবে।

বিশ্ব এইডস দিবস

সংলাপ রিপোর্ট

গত পহেলা ডিসেম্বর বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও বিশ্ব এইডস দিবস ১৯৯৫ পালিত হয়। দিবসটি পালন উপলক্ষে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে বিভিন্ন সংগঠন ব্যাপক কর্মসূচী পালন করে। এবছর দিবসটির মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল 'এইডস প্রতিরোধে দায়িত্ব এবং অধিকারের অংশীদারিত্ব' (Shared rights, shared responsibilities)। এই প্রতিপাদ্য বিষয়ের গুরুত্ব তুলে ধরে মূলত দিবসটিতে বিভিন্ন কর্মসূচী পালিত হয়। এবছরের বিশ্ব এইডস দিবসে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক নির্ধারিত প্রতিপাদ্য বিষয়টি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও সময়োপযোগী। মরণব্যাধি এইডস বিশ্ববাসীর জন্য এক উদ্বেগজনক রোগ। এ-রোগকে অনেকে বিংশ শতাব্দীর প্লেগ হিসেবে অভিহিত করে থাকেন। এ-রোগ এখন আর যুক্তরাষ্ট্র, আফ্রিকা বা ধনী দেশসমূহের রোগ নয়। এ-রোগ এখন আমাদের পার্শ্ববর্তী ও নিকটবর্তী দেশগুলোতে মহামারীর আকারে ছড়িয়ে পড়ছে। মায়ানমার, ভারত, থাইল্যান্ড ও নেপালে আক্রান্তের হার বেশি। জাতীয় এইডস কমিটির হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশে এ পর্যন্ত ৪৪ জন এইডস ভাইরাসে আক্রান্ত ব্যক্তি সনাক্ত হয়েছে। এদের মধ্যে ৩ জন রোগী ইতোমধ্যেই মারা গিয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশে কতজন লোক এইচআইভি ভাইরাসে আক্রান্ত তার কোনো সঠিক পরিসংখ্যান নেই। তবে ধারণা করা হয়ে থাকে, এই সংখ্যা আরো বেশি হবে। এ-অবস্থায় বাংলাদেশে এই ভয়াবহ রোগ বিস্তার প্রতিরোধ করা কেবল সরকার বা ২/১টি সংস্থার পক্ষে মোটেই সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে প্রয়োজন সকলের সম্মিলিত সহযোগিতা। তাই এবছর মূলত নারী-পুরুষ ও জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে এইডস প্রতিরোধে সকলকে দায়িত্ব নিতে হবে—এধরনের বক্তব্য আলোচিত হয়েছে। অর্থাৎ এইডসের মত ভয়াবহ রোগ প্রতিরোধে আমাদের সকলের দায়িত্ব পালনের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি এইডস প্রতিরোধে যে অধিকারের কথা বলা হয়েছে তা পারস্পরিক অংশীদারিত্বের মাধ্যমে করতে হবে। আমরা যদি আন্তরিকভাবে চেষ্টা করি তাহলে এইডস রোগের বিস্তার ও প্রাদুর্ভাব কমিয়ে আনা সম্ভব। আর এর জন্য প্রয়োজন সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণ।

স্বাস্থ্য কুইজ-১৫

১. বাংলাদেশে ভিটামিন 'এ'-এর অভাবে প্রতিবছর কতজন গর্ভবতী মহিলা রাতকানা রোগে ভোগেন?

২. আয়োডিনের অভাব হলে শিশুদের বুদ্ধিমত্তা বা আইকিউ কমে যায়। কি পরিমাণ আইকিউ কমে?

৩. বেশি তাপে মাংস সিদ্ধ করে রান্না করলে পুষ্টি-উপাদানের কোনো তারতম্য ঘটে কি?

৪. হেপাটাইটিস রোগ কিভাবে ছড়ায়?

৫. রক্তের স্বাভাবিক কোলেস্টেরলের পরিমাণ কত? রক্তে কোলেস্টেরল বেশি হলে কোন কোন খাবার খাওয়া উচিত নয়?

(উত্তর আমাদের কাছে ৩০ এপ্রিল ১৯৯৬ তারিখের আগেই পৌঁছাতে হবে।)

স্বাস্থ্য কুইজ-১৪-এর প্রশ্নের উত্তর

১. **গর্ভকালীন প্রধান প্রধান জটিলতাসমূহ হলো--গর্ভকালীন সময়ে:** রক্তপাত হওয়া; হাতে-পায়ে পানি নামা; অতিরিক্ত বমি হওয়া; প্রচন্ড মাথা ব্যাথা; খিচুনি হওয়া; জ্বর হওয়া; মূত্রতন্ত্রের সংক্রমণ; শ্বাস কষ্ট/অতিরিক্ত রক্তাল্পতা; অস্বাভাবিক অবস্থা।

২. একজন গর্ভবতী মায়ের আয়োডিনের অভাব হলে তার সন্তানেরও আয়োডিনের অভাব হবে। এতে গর্ভস্থ ভ্রূণ ও নবজাত শিশুর মস্তিষ্কের ভয়াবহ ক্ষতি হতে পারে। গর্ভবতী ও প্রসুতি মায়েদের আয়োডিনের অভাব হলে সন্তানের মস্তিষ্কের স্বাভাবিক বৃদ্ধি হয় না। ফলে অনেক সময় জন্মের আগেই শিশু মারা যায়। আবার যদি শিশুটি বেঁচেও থাকে তাহলে সে হাবাগোবা ও নির্বোধ হতে পারে। সে নানারকম শারীরিক ও মানসিক সমস্যায় ভুগতে পারে যার কোনো চিকিৎসা বা প্রতিকার নেই।

৩. নবজাত শিশুর ধনুষ্টংকারে আক্রান্ত হবার কারণসমূহ হলো :
   - গর্ভাবস্থায় যদি মায়ের টি টি ইনজেকশন না নেওয়া থাকে।
   - জীবাণুমুক্ত ব্লেড দিয়ে যদি শিশুর নাভি কাটা না হয়।
   - প্রসবের স্থান বা বিছানা যদি অপরিস্কার হয় বা ময়লা আবর্জনার কাছাকাছি হয়।
   - গোবরের ছাই বা চুলার পোড়া মাটি বা তেল নাভিতে দিলে।

৪. মায়ের বুকের দুধ কখনই নষ্ট হয় না। মা যদি অসুস্থও থাকেন তবু শিশুকে বুকের দুধ খাওয়াতে পারেন। বুকের দুধ সর্বদাই বিশুদ্ধ, শিশুর জন্য উপযোগী ও নিরাপদ।

৫. ডায়রিয়ায় আক্রান্ত শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ানো চালিয়ে যেতে হবে। কেননা এতে শিশুর শরীরের পানি শূন্যতা হ্রাস পেতে সাহায্য করবে এবং শিশু পরিমিত পুষ্টিও পেতে পারে। তাই শিশুর ডায়রিয়া হলে ORS খাওয়ানোর সাথে সাথে বুকের দুধ খাওয়ানো চালিয়ে যেতে হবে।

(স্বাস্থ্য কুইজ-১৪ -এর সবকটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর কেউই দিতে পারেন নি।)

সম্পাদনা পরিষদ

প্রধান উপদেষ্টা ঃ অধ্যাপক ডেমিসি হাবতে; **সম্পাদক ঃ** ডাঃ ফকির আঞ্জুমান আরা; **ব্যবস্থাপনা সম্পাদক ঃ** এম. শামসুল ইসলাম খান; **কনসালটেন্ট এডিটর ঃ** ডাঃ মোড়ল নজরুল ইসলাম; **সদস্য ঃ** ইউসুফ হাসান, মুহম্মদ মুজিবর রহমান, ডাঃ তানজিনা মির্জা, ডাঃ শামীম এ. খান, ডাঃ অমল মিত্র ও শামীম আরা জাহান; **ডিজাইন ঃ** আসেম আনসারী; **প্রকাশক ঃ** আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ (আইসিডিডিআর,বি), জিপিও বক্স ১২৮, ঢাকা ১০০০। ফোন ঃ ৬০০১৭১-৮; ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৮৮৩১১৬; টেলেক্স ঃ ৬৭৫৬১২ আইসিডিডি বি.জে

মুদ্রণে ব্র্যাক প্রিন্টার্স ঢাকা বাংলাদেশ